পাঠকের চোখে তারাপদ রায়ের কবিতা

তপন গোস্বামী

একদা কবি তারাপদ রায় লিখেছিলেন----
গাববুই গাববুর জন্য লিখে যায় গাববু - গাববু অসংখ্য কবিতা
....
গাববুই গাববুর জনে রেখে যায় গাববু - গাববু অসংখ্য কবিতা।

কবিতাটির ব্যঙ্গ খুবই প্রত্যক্ষ যারা কেবল নিজের জন্য লেখেন এবং সেই কারণেই পাঠকের বোঝা না - বোঝার কোন ধার ধারেন না, তাদের কবিতায় প্রায়শই বাসা বাঁধে অস্পষ্টতা। তাদের ভাব বা ভাবনা কবিতায় প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এমন অনেক লাফ থাকে, যা পাঠকের কাছে কবিতাকে দুরূহ করে তোলে। তাছাড়া নিজের জন্য অনেক সময়ই প্রসাধনকলার নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না, পরের জন্য হয়। গাববুর কবিতা তাই হয় গাববু গাববু। এই গাববুমার্কা কবিতা থেকে তারপদ রায় চিরকাল দূরে থাকতে চেয়েছেন। 'শ্রেষ্ঠ কবিতার' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-------
"আমি কখনো এমন কিছু লিখিনা যা স্পষ্ট নয়, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, যা আমি নিজে জানি না বা বুঝি না।"

তারাপদ রায়ের কবিতার সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে এই কথার সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না কথা বলার ঢঙে তিনি কবিতা লেখেন, দৈনন্দিনতার চালচিত্রে তিনি ঘোরেন ফেরেন, সাধারণ মানুষের কথার মতোই সহজ সরল তাঁর কবিতা। তাঁর একটা কাব্যের নাম 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু'।--- বড়ো বেশি সরাসরি, ভাবনা বা উপস্থাপন, কোথাও কোন গ্রন্থি নেই। তাই তারাপদ রায়ের কবিতা পছন্দ করেন বহু পাঠক এবং একই কারণে পছন্দ করেন না বেশ কিছু পাঠক। কিন্তু দুর্বোধ্য না হলেই যে কবিতা লাবণ্য এবং ব্যঞ্জনাহীন হবে, সহজ হলেই যে তা বিবৃতির মতো নিপাট হবে, এমন সরলীকরণ বাংলা কবিতার সাবালক পাঠকেরা করবেন না। এই সূত্রে আমরা তারাপদবাবুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমার প্রতিমা'-র দুটি কবিতা থেকে কিংয়দংশ উদ্ধার করি---

আপনারা কি মনে করেন
বয়েস কি শেয়ালদা স্টেশনে
সাড়ে দশটার ট্রেন ফেল করে থতমত দাঁড়িয়ে রয়েছে?

অনেক দূরের দিনে, অনেক দূরের গ্রামে
স্মরণের পাঁচিলে লতা হয়ে দোলে
অঘ্রাণের নিদ্দেশ কুয়াশা।

তণ তারাপদ সেদিন যা লিখেছিলেন, আজকের প্রথিতযশা পরিণত যেকোন কবি এরকম চরণ লিখতে পারলে শ্লাঘা বোধ করতেন।

"আমি চেষ্টা করলেও এখন আর আমার গৃহস্থীয়ানা ছাড়তে পারব না" --- ১৯৮৯-এ সরল স্বীকারোক্তি তারাপদর। আমাদের মতে এই অবলম্বনই তাঁর কবিতাকে অনন্যতা দিয়েছে। ফেলে আসা দেশ-গাঁ, ঘরবাড়ি, সন্তানসন্ততি, পাড়া

প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, ফ্রেমে হলুদ হয়ে আসা ফটো, নিজের হাতে লাগানো গাছ---এই সব মিলিয়ে কবির মধ্যবিত্ত সংস
ার। এই সংসারকে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতার পরতে পরতে বড়ো মমতায়। আমরা যারা ভাঙা সংসারের বার
ান্দায় দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চাঁদ দেখি, তাদের কাছে এই গৃহস্থালি এক স্বপ্নের দেশ। 'ঠাকুমার ছবি' কবিতার উজ্জ্বল উদ্ধ
ার---

আমার ঠাকুমা তার রূপ, আর তার
রূপকথা দীর্ঘদিন দীর্ঘ রাত্রি নিয়ে
আজ শুধু মৌন ছবি, পলেস্তারা খসা
পুরানো দালান আজ তাকে ঘিরে শুধু
দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ---ঠাকুমার ছবি

এভাবেই কালের বাতাসে 'জীর্ণ নীড়ে পাতা নড়ে' আমাদের জীবনে কিছু মায়া ছড়িয়ে 'শতাব্দীর খড় উড়ে যায়'। উল্লেখ করতে ইচ্ছা করে একটি সম্পূর্ণ কবিতা যখানে লতাপাতাসহ সংসারের উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু তাকে ফ্রেমের মতো ধরে রেখেছে চলমান নৈসর্গিক চালচিত্র ---

আমার এত ভাল লাগে এই সব ছোটখাটো হাঙ্গামা।
হাওড়া ব্রিজের নিচে দেড় ঘন্টা আটকিয়ে থেকে
তারপর ছুটতে ছুটতে একেবারে শেষ মুহূর্তে
পলাতক আসামীর মতো রেলগাড়ি ধরে ফেলা,
জলের কুঁজো ভেঙে চৌচির,
বড় বৌদির হাতব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে না
কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন উত্তরপাড়া স্টেশন পেরিয়ে
লম্বা টানা ডোবায় দ্রুত ছায়া ফেলে ছুটে চলেছে
পেয়ারা ফুলের গন্ধভরা শরৎকালের হাজারিবাগের দিকে।

সত্যিই কি হাজারিবাগ যাচ্ছি আমরা ?
ভুল গাড়িতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়িনি তো ?
হাজারিবাগ রোডের বাড়িওলা আমাদের পোস্টকার্ড পেয়েছেন কি?
বড়বৌদির ব্যাগে ঠিক কি কি ছিলো ?
আমার তো ভালো লাগে এইসব ছোটখাটো হাঙ্গামা,
উত্তর পাড়া স্টেশন পেরিয়ে ডোবার জলে
অনিশ্চিত রেলগাড়ির দ্রুত চলন্ত ছায়া
আমার চমৎকার লাগে। --- চমৎকার লাগে

তারাপদ রায়ের স্ত্রীর নাম যে মিনতি রায়, তাও তাঁর কবিতা থেকেই আমাদের জানা হয়ে যায়। সব ক্ষেত্রে যে গৃহস্থালি এইরকম দাগিয়ে দেওয়া তা কিন্তু নয়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন ঘুরেফিরে আসে আমাদের চৌহদ্দি, স্বল্পবিত্ত জীবনের ছোটখাটো সাধ-আদ, সুখ দুঃখের মধ্যবিত্ত ছক, তেমনি কাঙ্ক্ষিত মানুষের জন্য প্রতীক্ষার আর্তিতেও গুঁড়ো গুঁড়ো মিশে যায় আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিকতা---

লেবুফুলের গন্ধে আচ্ছন্ন আমাদের সারা সকাল,
তুমি এলে না।
সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেলো আমাদের জন্মদিনের সন্ধ্যা,
তুমি এলে না।
আমাদের ডালের বড়ি দেয়া কই মাঝের ঝোল,

আমাদের লাউ সুত্তো, আমাদের কনিয়াকের শেষ চুমুক।
আমাদের ছেলে স্কুল থেকে কলেজে গেলো,
আমরা পুরনো বাড়ি থেকে আরো পুরনো বাড়িতে এলাম
আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি,
তুমি কখন এসে জিজ্ঞাসা করবে,
সব ঠিকঠাক ভালোমতো হলো কিনা।'
--তুমি এলে না
আগোগোড়াই ছিল, তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গৃহস্থালি তাঁর বেড়েছে, কবিতায় আরো বেশি জীবনরস সঞ্চার করেছে। তাই তাঁর কবিতায় আমরা বেশ 'হোমলি' বোধ করি। আজও আমাদের 'মোজা ছিঁড়ে গেলে কারো কথা মনে পড়ে, / কই মাছ খেতেগেলে কারো কথা মনে পড়ে।' ভাবনার উর্বরতা, পরিকল্পনার অভিনবত্ব এবং উপস্থাপনের মৌলিকতায় তারাপদ রায় বাংলা কবিতায় একটি নিজস্ব ক্ষেত্র অর্জন করেছেন। এগুলোর অনুপস্থিতিই আজকের কবিত ার রক্তহীনতার অন্যতম কারণ। কবিরা কথার কারবারী, কিন্তু সে কথা যদি কেবল বাতাসে সাঁতার কাটে, কথা যদি থেকে যায় কেবলই কথা তাহলে কী হতে পারে, সে ব্যাপারে জীবনানন্দ আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন----
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো,
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষন; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের বল্কলে
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।---১৯৪৬-৪৭
তারাপদ রায়ের বচন এবং বাচন এই আলোকবঞ্চিত নয়। উপলব্ধির সততাই তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে বলিষ্ঠ করেছে। এবং বল াবাহুল্য অভিনব। প্রথম দিকে লেখা একটি কবিতা 'লাল ডায়েরি' ভাবনার নতুনত্বে আমাকে মুগ্ধ করেছে---
কি আশ্চর্য!
তোমার বাড়ির সামনে বকুল ছিলো না,
আমার ডায়েরিতে দ্যাখো,
এই তো বকুলগাছ, এই কমাটার পাশে শালিকের বাসা।
সমস্ত ঠিকানা কবে ছবি হয়ে গেছে,
যে যার বাড়িতে আছো।
বর্ষাতি জড়িয়ে আমি প্রথম বৃষ্টিতে চলে যাবো;
তোমার বাড়ির পিছে কদমবাগান,
ফুল ফোটে আমার ডায়েরিতে।
সাদা কাগজের সঙ্গে নিসর্গের এই মৈত্রী প্রকৃত অর্থেই ঋতুবদল ঘটায়। এবার চলে যাচ্ছি গত শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা একটি কবিতায় --- 'গ্রামে আছি'।
সম্পর্ককে অনেকেই সাঁকোর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কিন্তু নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোর একটা ছবি এঁকে তাকে দৃশ্যগ্রাহ্য ও সংবেদনশীল করে তুলবার চেষ্টা করেনি। কবিতার কিছুটা তুলে দিচ্ছি---
'মনে আছে' এবং 'ভুলে গেছি',
এই দুটি পুরনো গ্রামের মাঝখানে
একটি নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো।
খুব সাবধানে পার হতে হবে,
পা টিপে টিপে বাঁশের হাতলে সাবধানে,
খুব সাবধানে হাত রেখে,
পার হতে হবে
পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছর চলে যায়।

এই প্রসঙ্গে এত চমৎকার চিত্রকল্প আমার আগে চোখে পড়েনি। তারাপদ নিজেই বলেন --- 'নিজের ব্যাক্যের বাণে সতত অস্থির আছি প্রভু'। তারপর প্রায় অনিবার্যভাবে দু'টি স্মরণীয় চরণ আমরা উপহার পাই---

আমাকে বাচাল যদি করেছো মাধব,
বন্ধুদের করে দিয়ো কালা।

প্রথমদিকের অনেক কবিতায় ঈশ্বর ফিরে ফিরে এসেছেন কখনো কবির বন্ধু কিংবা আড্ডাধারী হয়ে, কখনো ব্যঙ্গ - বিদ্রুপের লক্ষ্য হয়ে। একটা কবিতায় লিখেছেন---

ইচ্ছে হয়, যে কোন সুযোগ পেলে ঈশ্বর তোমাকে
শেয়ালদা বা হাওড়া গিয়ে 'সি - অফ্' করে আসি; --- একটি নমস্কারে

দেবাদেশে কাব্য রচনা করা একসময় ছিল খুব গৌরবের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতার বনিয়াদটাই ছিল দেবনির্ভর।উনিশ শতকের আত্মসচেতন কবি মধূসদন 'মেঘনাদবধ - কাব্যে'র সূচনায় দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। আজকের অনেকতণ কবিও কবিতা রচনার ডায়েরী বা খাতার প্রথমে সরস্বতীর নামটা লিখে রাখে। প্রতিভাতত্ত্ব বা নেশায় মাহাত্ম্য মাঝখানে এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছিল যে অনেক কবিই ঋাস করতে শু করেছিলেন যে তিনি নন, কেউ যেন ভেতর থেকে তাঁকে দিয়ে লিখিয়েনেন। ভিন্ন মতও ছিল অবশ্যই, কেবল বামপন্থীরা নয় স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যের প্রেরণা হিসাবে মেধা ও অনুশীলনকেই মূল্য দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারাপদ রায়ের ভাবনাটি আমরা দেখে নিতে পারি---

জয়দেবের কথা মনে রেখে
তোমারই জন্য দারোয়ান রাখবো বাড়িতে।
তুমি যাই করো, ঈশ্বর,
আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে,
আমার ছদ্মবেশে
আমার কবিতা সম্পূর্ণ করতে এসো না। --- ঈশ্বর ও আমার কবিতা

এতটাই আত্মনির্ভর তারাপদ, এতটাই নিজস্ব তাঁর উচ্চারণ! আমার কবিতা, তা ভালো মন্দ যাই -ই হোক, সম্পূর্ণভাবে হোকআমারই কবিতা --- এরকমই ঋাস তারাপদর। এখানে প্রাসঙ্গিকতা সূত্রে আমরা তারাপদর আত্ম-মূল্যায়নটি তুলে ধরতে চাইছি---

"আমি সচেতনভাবে সাবালক হওয়ার পর থেকে চেষ্টা করেছি, এখনো চেষ্টা করছি, আমার নিজের মতো লিখতে, নিত ান্তই নিজের ভাষায় নিজের কথা, আর মধ্যে অন্য কারো ছায়া আমি কখনোই জ্ঞাতসারে পড়তে দিইনি। আমার সেই এক ান্ত আমার কবিতা, যা কখনো কখনো অতিকথনে ক্লান্ত, পুনরাবৃত্তিতে একঘেয়ে, তার পুরো দায়দায়িত্ব আমার।"

এই তারাপদই লিখতে পারেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরকম কথা---

ভাবতে গেলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়,
প্রভু, সরিয়ে নিন আপনার রচনাবলী,
....
পঁচাত্তর টাকায় ঘর ভরে গেলো।
আমাদের কথা বলছি না
কিন্তু প্রভু, আপনি কি ক্লান্ত হন না? --- প্রভুর প্রতি

জীবনানন্দের আচ্ছন্ন করা প্রভাব বলয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে লিখতে পারেন এরকম কথা---

স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা কন।
দুলাইন লিখে নিতে দিন, একটু একটা লিখতে দিন
আপনার উৎপাতে বড় ব্যতিব্যস্ত আছি।
আট বছর আগেকার লাশকাটা ঘর থেকে---

রক্ত মাখা ঠোঁটে
প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই, কেন,
আমার ঘরের মধ্যে কেন?
দয়া করে বারান্দায় অপেক্ষা কন। ---জীবনানন্দ দাশ ১৯৬২

এসব কবিতা তারাপদ লিখে ফেলেছেন তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকেই, বস্তুত তখন থেকেই তিনি নিজস্বতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন সচেতনভাবে। তাঁর এই নিজস্বতার ক্ষেত্রগুলি তখন থেকেই তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন। তারাপদ পারৎপক্ষে কল্পনাকে মাথায় চড়তে দেননি, প্রত্যক্ষ জগৎকে তিনি বেশি মূল্য দিয়েছেন। এখানেও তাঁর নিজস্বতা নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তিনি কোন দর্শনের চশমা পরে বস্তুজগৎকে দেখেননি, দেখেছেন খালি চোখে পূর্বপোষিত কোন ধারণা ছাড়াই, দেখার আনন্দে। দৈনন্দিনতার মধ্যে জীবনের যে রঙ থেকে এবং মুশায়েরা লুকিয়ে, তাকে লোকচক্ষে এনেছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো পথচলতি ঘটনার তিনি বড়ো কোন তাৎপর্য আবিষ্কার করেননি, ধানের শিষের ওপর শিশির বিন্দুর সৌন্দর্যও তিনি খুঁজতে যান নি, সূর্যালোকের মতো এই বস্তু পৃথিবীর ওপর প্রতিফলিত বহুবর্ণ জীবনকে সন্ধান করেছেন তিনি। তাই কল্পনার হিস্টিরিয়া থেকে তাঁর কবিতা একেবারেই মুক্ত। তিনিই লিখতে পারেন ‘চুনী গোস্বামীর মতো সাবলীল সহজ বাতাসে’র উপমা, টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন বিড়ালছানার একটানা একঘেয়ে ড াকের। চিরদিনের নন, তিনি প্রতিদিনের কবি।

কেউ কেউ বলেন, চৈতন্যদেব নাকি বাঙালীকে ছিঁচকাঁদুনে করেছেন, কেউ কেউ লিরিকের বাড়াবাড়ি অভিযোগ তোলেন রবীন্দ্রনাথের বিদ্ধে, তিনি নাকি বাংলা কবিতার নাড়া বেঁধে দিয়েছেন লিরিকে। অভিযোগের অতিরেকটুকু সরিয়ে নিলে অবশ্যই কিছু সত্য থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার খুব বড়ো শিল্পী, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তাঁর গীতিময়তার ছিল মোহিনী মায়া, ছিল সর্বাচ্ছন্নকরা প্রভাব, সহজেই মজলেন তণ কবিরা। জনপ্রিয়তার সস্তা পথ হিসাবে অনেকেই বেছে নিলেন লিরিককে। কিন্তু র বীন্দ্রনাথের প্রতিভার ভগ্নাংশও ছিল না এদের। ফলে যা হবার তাই হল। লিরিকের নামে তরল সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি, নাকের জল চোখের জল এক হয়ে গেল। বাঁক অবশ্য ফিরল বাংলা কবিতা আধুনিক পর্যায়ে কিন্তু রেশ রয়ে গেছে আজও। স্বভাবতই আপাদমস্তক অ্যান্টিলিরিক্যাল ‘বাচাল’ তারাপদর অস্বস্তি অনুমেয়। তারাপদ লিখলেন---

কে আপনাকে বলেছিলেন, ‘বসন্ত রোদন ভরা,’
আপনি দেখেছিলেন?
হায়! হায়!
আপনি সব জেনে শুনে আমাদের সর্বনাশ করে গেছেন,
যে দিকে তাকাই শুধু লিরিকের লতা,
হাওয়ার গড়িয়ে পড়ে,
ন্যাকা মেয়েছেলে যেন কিছুই জানে না। --- রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তা বলে তারাপদ কি লিরিক লেখেন নি? লিখেছেন, প্রথমদিকে বেশি, পরের দিকে নিতান্তই কম। কী রকম সে লিরিক?

জলে ভেজা এমন সন্ধ্যায় মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ লতায়
মমতাজমহলের হাসি।
কারা যায়, কারা ফিরে যায়, কার মুখ আলোয় ছায়ায়
কাকে আমি আজো ভালোবাসি?
---মমতাজমহল

যদি ভাবো ভুলে গেছি, কুয়াশায় শীতের সন্ধ্যায়
জীবনানন্দের সেই অবসন্ন হলুদ পাতাটি
একা একা ঝরে গেছে পোড়ো মাঠে শিশিরে ও হিমে,

স্মৃতিহীন পরস্পরাহীন যদি দিন চলে যায়
যদি পাখি দুটি ম্লান আদ্যক্ষর একদিন কবে
যদি ভাবো মনে নেই, তাই হোক, তবে তাই হবে।
---মনে নেই

খুব বেশি অরাবীন্দ্রিক বলে তারাপদ নিজেও নিশ্চয়ই দাবী করবেন না। কিন্তু এটা তো তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তিনি বরং লিখতে পছন্দ করেন কালো জিরো আর কাঁচা লঙ্কার কবিতা যা আমাদের ব্যঞ্জনে স্বাদ এনে দেয়। তাই তাঁর প্রেমের কবিতাতেও লাগে অন্যরকম সুর। এতাবৎকালের প্রথাসিদ্ধ প্রেমের কবিতায় ব্যবহৃত ফুল কিংবা নিসর্গ অমর্ত্যলোকের ইশারা নিয়ে অ াসত। তারাপদ সেসব সরিয়ে ব্যবহারিক জীবনকে জায়গা করে দিলেন---

বলো তাকে, 'তুমি কি বোঝো না,
আরো একজন আছে এ পুরনো ম্লান মফঃস্বলে
যে শুধু তোমার জন্য,
শুধুই তোমার জন্য
আজো যত্নে তুলে রাখে গোলাপী তোয়ালে
আনকোরা সুগন্ধসাবান।' ---মফঃস্বল

অম্লশূলে তুমি বড়ো কাহিল হয়েছো, কিন্তু তবু
আলোকরঞ্জন যাকে 'সুশীর্ণ' বলেন এতদিনে
তুমি তাই, তুমি তাই, আমার পরান যাহা চায়,
সহজ বহনযোগ্য; ভারবাহী অক্ষম পশুকে
ক্ষমা করো; স্থুলতা কেমন যেন দমবন্ধ করা
কাঁধে বড় চাপ লাগে, তার চেয়েমিতাই ভালো
তন্বী, শ্যামা, প্রাণাধিকা, এতদিনে নয়ন জুড়োলো। --- এতদিনে

বোতাম পুরাতন, লিরিকের যথাচালিত কাঠামো, সুরে ঢালা গীতলতা, মদ কিন্তু নতুন, আদ্যন্ত অ্যান্টিলিরিক্যাল। ওপার বাংলা, অধুনা বাংলাদেশ তারাপদর জন্মভূমি। স্মতিকাতরতা তাই স্বভাবতই তারাপদর অবলম্বন এবং আশ্রয়। ফেলে অ াসা দেশের প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। একসময় 'বাংলাদেশ ১৯৭১' নামে একটি সিরিজ লিখেছিলেন তারাপদ। এই স্বদেশ -প্রেমের কবিতাতেও তারাপদ নিজের স্বভাবস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেছেন। প্রকৃতি বন্দনার চিরাচরিত পথে এ ধরনের কবিতার একটা ঝোঁক থাকে, ঝোঁক থাকে কল্পনায় দেশজননীর কল্পচিত্র অঙ্কনে আতিশয্যের। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে আবেগবিহ্বল হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে আতিশয্য তার সহচর। তারাপদরও আবেগ আছে এবং তার সততা নিয়ে আমাদের সংশয়কে থামিয়ে দেয় তাঁর কবিতা।স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তারাপদর আবেগ সম্ভবক্ষেত্রে বস্তুআশ্রয়ী, স্মৃতিকাতরতা প্রত্যক্ষ জগৎকে বেশি মূল্য দেয়। 'বাংলাদেশ' নামে কবিতায় আমরা দেখতে পাই, সম্পাদকের অনুরোধেও তিনি বাংলাদেশকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারছেন না, কেননা হট্টগোল কি করে যে তাকে কবে হা রিয়ে ফেলেছি। পাঠক লক্ষ্য কন এই 'হট্টগোলে' শব্দটি, আমাদের হট্টগোল। আমাদের লোকদেখানো বাংলাদেশপ্রীতি,অ ামাদের চোখের জলের বানিজ্য, আমাদের বানিয়ে তোলা উচ্ছ্বাস বিরক্ত করেছে তারাপদকে। তিনি এই সুরে গলা মেল াতে চাননি। তাই লিখছেন---

সম্পাদক মহাশয়, ক্ষমা চাই, সেন্টিমেন্ট নিয়ে
আর কোন খেলা নয়, বাংলাদেশ, তোমার কাছেও ক্ষমা চাই।

এই সিরিজের 'জানুয়ারী ১৯৭২' কবিতায় পাকসেনাদের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষের ঘরে ফেরার অ ানন্দের কথা বলা হয়েছে। এখানেও তারাপদ নির্বস্তুক আবেগে ভাসেন নি, বস্তু - প্রতিমায় বরং চমৎকার মূর্তি দিয়েছেন সে আনন্দকে---

বন্দুক, ঘরে ফিরে চলেছে ঘরপোড়া মানুষ
ঘরের ফিরে চলেছে আত্মীয় - হারা মানুষ,
এককোটি মাইকেল মধুসূদনের হাত ধরে
ফিরে চলেছেন এককোটি জীবনানন্দ দাশ,
এক কোটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাত ধরে
ফিরে চলেছেন এককোটি ফজলুল হক।
ফিরে চলেছে শাজাদপুর শাড়ির কাঁখে ইসলামপুরী কলসী
পদ্মার ইলিশের পিছু পিছু সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল।

কবিতাটি নিজেই তার টীকা রচনা করেছে, সুতরাং আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আসলে কি এ পর্যায়ে প্রথাসিদ্ধ অ াবেগের কবিতা নেই তারাপদর, আছে। তবে সেখানেও দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের সঙ্গে অনুভূতির একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়---

কিন্তু বৃষ্টি এলে আমরা কদমফুলের গন্ধপাবো,
আর তখনই আমাদের নবাবগঞ্জের কথা মনে পড়বে
কামরাঙা গাছের নিচে আমাদের ছোটবেলার নবাবগঞ্জ-----
সেই নবাবগঞ্জে একটিও কদমগাছ ছিল না। ----নবাবগঞ্জ

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র ভূমিকায় তারাপদ নিজেই জানাচ্ছেন----

“আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি মুখের ভাষায়।.... নেহাতই কথ্য ভাষায় আমি আমার পাঠকদের পৌঁছে দিতে চাই দু-একটি স্বপ্ন, দু-একটি কল্পনা, কিছু দৈনন্দিনতা।”

মুখের ভাষায় কবিতা লেখার চেষ্টা বহুদিন আগেই শু হয়েছে, তারাপদ পথিকৃৎ নন। বস্তুত আধুনিক বাংলা কবিতার একটা প্রবণতাই হল কবিতার ভাষাকে মানুষের কথা বলার সমতলে নিয়ে আসা। এখানে অবশ্য একটা ভিন্নমতও আছে। কেউ কেউ চান, কবিতার ভাষা হোক কথ্য ভাষার একটি সমান্তরাল ভাষা, কেননা দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষার আমাদের আবেগ স্পন্দিত হয় না। ভাষার সাদৃশ্য মেনেও তাঁরা আপাত দূরত্ব তৈরি রাখতে চান মুখের ভাষা ও কবিতার ভাষার মধ্যে। কিন্তু সরাসরি মুখের ভাষায় কবিতা লিখেছেন, সব না হলেও অনেকগুলিই, এমন উদাহরণ বিরল নয়। কিন্তু সেখ ানেও সর্বত্র কথা বলার সুরটি জেগে ওঠেনি, দৈনন্দিনতা সঞ্চারিত হয়নি। আমাদের ব্যবহারিক কথাবার্তায় একটা গতি আছে, একটা আটপৌরে ভাব আছে, পোশাক পরলে এগুলো মিলবে না, বিষয় নির্বাচন এবং উপস্থাপনার কৌশলটিও জ ানতে হবে, রপ্ত করতে হবে উচ্চারণটিও। এইখানেই তারাপদ তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে কিছুটা এগিয়ে আছেন। আমরা বরং দু-চারটে নমুনা তুলে ধরি---

সেদিন কথাবার্তা হচ্ছিল কাঁচালঙ্কা নিয়ে
পঞ্চাশ গ্রাম কাঁচালঙ্কা
এখন আর পঁচাত্তর পয়সার কমে পাওয়া যাচ্ছে না,
এই নিয়ে বড়লোকেরা খুব হাহুতাশ করল।---কাঁচালঙ্কা

মেদিনীপুর একটি বড় জেলা,
সেখানে একটি ছোট জায়গা বাড়মানিকপুর।
সেখানে সেই বাড়মানিকপুরে থাকে দীপকবাবু
মানে শ্রীযুক্ত দীপক কর, সম্পাদক ধানসিড়ি। ----ধানসিড়ি

প্রিয় চাষীভাই,
তুমি এই উন্নয়ণশীল দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
তোমাকে আমি দশবার বেচেছি ব্বিব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের কাছে,

ঝিব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান,
ম্যাকনামারা সাহেব তোমাকে বেশ ভালোবাসতেন। ---প্রিয় চাষীভাই

পাঠক লক্ষ্য করবেন, বাক্যের দৈর্ঘ্য এবং বিরতি কিভাবে আমাদের কথা বলার ছাঁদকে অনুসরণ করছে। এই কৌশলটা অনেকে রপ্ত করতে পারেন না বলে কথা শেষ পর্যন্ত আর কথা থাকে না, কেবল ভাষার প্রদর্শনী হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুও এখানে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মানানসই। অনেকে বলতে পারেন এ ভাষা বড়ো বেশি বিবৃতিধর্মী, ছবি কই! কোথায় আশ্রয় পাবে কবিতার লাবণ্য, দুরসঞ্চারী ব্যঞ্জনা? আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে উপমা থাকে না তা নয়, তবে তার জাত আলাদা, স্বাদে গন্ধে তাকেও হতে হবে ব্যবহারিক। এক্ষেত্রেও তারাপদ চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন কিছু উপমা, আগে কেউ যা কখনো ভাবেন নি। বহু ব্যবহারেজীর্ণ কাব্যগন্ধী উপমায় কথ্য ভাষার রঙ কখনো ফোটে না, তার জন্য দরকার হয় প্রত্যক্ষগোচর জগতের বস্তুআশ্রয়ী উপমা--- একথা তারাপদ আমাদের বুঝিয়ে ছেড়েছেন। আসুন, আমরা বরং কবিতায় যাই---

লেফট্ - রাইট - লেফ্ট, লেফট্ - রাইট ... ফায়ার!
পাকা গাবফলের গন্ধের মত থমথমে কবিতা,
ভাগচাষীর বারো আনা ফসলের মত ঝকঝকে কবিতা,
মহার্ঘভাতা ঘোষণার আনন্দের মত ঝলমলে কবিতা,
বন্ধুগণ, আপনারা ফায়ার করে যান। -- আবার কবিতা লেখার দিন

বাজে কবিতা লেখার মতো স্বাভাবিক তুমি।
দমকা হাওয়ার নড়বড়ে ছাতা উলটে যাওয়ার মতো
মাস শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পরেও
ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়তে ভুলে যাওয়ার মতো।
বিনা বাক্যে সব কিছু মেনে নেওয়ার মতো,
যুদ্ধের মাঠ থেকে বারবার পালিয়ে আসার মতো,
স্বাভাবিক
স্বাভাবিক তুমি।
---স্বাভাবিক তুমি

ডাকাত পড়ার মতো হৈ চৈ করে
বুনো ষাঁড়ের মতো, সোঁ সোঁ করে
বৃষ্টি। --শিলিগুড়িতে বৃষ্টির মধ্যে
তুলোর পুতুলের বুড়োর দাড়ির মতো
সতত সঞ্চরমান শুভ্র মেঘমালা --- সামান্য নীলিমা

তুমি আমার ভেঙে যাওয়ার আঙ্গুরবালার রেকর্ড
বনলতা সেনের প্রথম সংস্করণের মলিন মলাট,
দিনশেষে স্তব্ধ নীল আকাশে নিভন্ত সাদা পাখি,
তুমি আমার সত্তরের দশক, মুক্তির দশক---
---শেষ না হওয়া কবিতা

ছন্দ বা কবিতার গঠন নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা - নিরীক্ষা নেই তারাপদর কবিতায়। তাঁর কবিতার বিষয় এবং বিন্যাস প্রচলিতগদ্যছন্দেই খোলে ভালো। যে দৈনন্দিনতাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতায়, স্পন্দমান কাব্যভাষা এবং নিয়মিত ছন্দে তা কখনোই ফুটে উঠত না। একথা তো তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন---

“সাহিত্যের ব্যাকরণে যাকে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করা বলে তা হয়তো সচেতনভাবে আমি কখনো করিনি। ....আমি যে ধরণের কবিতা লিখি, তাকে সুললিত ছন্দে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।” ---শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা (১৯৮৯)

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে যতগুলো উদাহরণ তুলেছি, তার প্রায় সবগুলো তারাপদর বচনের সত্যতা স্বীকার করে। অবশ্য অবশ্যই, এটাই তারাপদর কবিতার সারসত্য। তবু ব্যতিত্রমী উদাহরণ কিছু আছে। কবিতাচর্চার প্রথমদিকে তারাপদকবিতা গঠন এবং ছন্দ নিয়ে কিছু পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু কবিতা আমাদের চোখে পড়েছে ‘ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন (১৯৬৭)’ এবং ‘নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক’ কাব্যে। নিয়মিত ছন্দে অসমান চরণ দৈর্ঘ্য মিলের বন্ধন স্বীকার করেও বাকস্পন্দকে ধবনিত করেছে নিচের কবিতায়---

সাহসিনী
চায়ে বড় দিয়েছিলে চিনি
দুধ কম;
তবু ভালো; এই তো প্রথম
তোমার হাতের তৈরি উষ্ণ পানীয়ের
যতটুকু তাপ মেলে তারই স্বাদ ঢের। ---সাহসিনী

কেবল কান নয়, আমাদের চোখও তৃপ্তি পায় কবিতার এই চেহারায়। ঐ কাব্যেই লিমেরিকধর্মী একটা কবিতা বিন্যস্ত হয়েছে ছ.টি চরণে অ-লিমেরিক মিলবিন্যাসে---

কাঁসার গোলাসে লিখে রেখেছিল নাম
পুরানো ধাতুর দাম
সে গেলাস কবে একেবারে
বিত্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে
আজকাল কারা পান করে,
তোমার নামের জল আজ কার ঘরে?
---কাঁসার গেলাস

মিলের বৈচিত্র্য কখনো কখনো প্রচলিত ছন্দেও বৈচিত্র্য নিয়ে আসে, তার সঙ্গে যদি যুত্ত হয় আমাদের কথা বলার ভঙ্গি ত াহলে একে বারেই পাল্টে যায় তার অভিঘাত। আমরা দেখব নয় চরণের (এরকম বেজোড় চরণে বহু কবিতাই রচিত) একটি সম্পূর্ণ কবিতা---

বল্লম গিয়েছে চুরি কাল রাতে, নীল পাগড়ী কেটেছে ইঁদুরে,
আপনাদের গাঁয়ে বড়ো তস্কর ইঁদুর মহাশয়
সামান্য আঠেরো টাকা বেতনে কি এতো সহ্য হয়?
যত সব বদমায়েশ ভূতের বেশাতি - চৌকিদার পর্যন্ত মানেনা,
বাঁশঝাড়ে অন্ধকারে ভুল করে চাঁদ চাঁদের চিৎকার।
ভয় পেয়ে পাখিগুলো ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে ওঠে;
মধ্য রাত্রে এইসব ভালো লাগে কার!

বাক্যের অম্বয়ে ত্রিয়াপদকে এগিয়ে নিয়ে এসে তারাপদ কাব্যসুরের প্রচলিত প্রথার দিকে যদি এক পা এগিয়ে থাকেন, দু’প া এগিয়েছেন কথ্যভাষার গদ্যধর্মী সুরের জগতে। ফলে কবিতাটিতে প্রচলিত কাব্যভাষা এবং ব্যবহারিক ভাষার একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, কবিতার পঞ্চম চরণের বে - মিল উপস্থিতি এই দ্বন্দ্বকে সঞ্চার করেছে পাঠকের কানে এবং মনে। চৌকিদার ও চাঁদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটাই কবিতাটির ধবনি - সংঘর্ষে মূর্ত হয়েছে।

আলোচনার উপসংহারে বত্তব্যের পুনরাবৃত্তি না করেও বলা যায়, তারাপদ বাংলা কবিতায় অনেক আগেই নিজস্বতা অর্জন করেছেন। হাজার কবিতার মধ্যে থেকে অনায়াসে তারাপদর কবিতাকে আলাদা করে দেওয়া যাবে, তাঁর সুর এক ান্তভাবেই তাঁর। মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিদিনের জীবন তারাপদর কবিতার অবলম্বন, মুখের ভাষা তাঁর আয়ুধ, অকাব্যধর্মী

ব্যবহারিক উপমা তাঁর কাব্যে দৈনন্দিন জীবনের রঙ সঞ্চার করে। তারাপদ সরাসরি কথা বলতে ভালোবাসেন, তাঁর কবিতাও তাই সরাসরি, কোনরকম রহস্যাতুরতা বা বত্রতার অবকাশ নেই। তিনি প্রত্যক্ষ জগতের কবি, প্রত্যক্ষ অনুভূতির কবি, উপস্থাপনেরও তিনি বজায় রাখতে চান প্রত্যক্ষতাকে। এতে কি কবিতার শিল্পগুণ কমে যায়? কিছুটা যে যেতে পারে তা তো অস্বীকার করা যায় না। এজন্য কারো কারো কাছে তারপদর কবিতাএকঘেয়েও লাগতে পারে, পুনক্তি প্রবণ এবং এই অর্থে ক্লান্তিকরও মনে হতে পারে। কিন্তু বোধহয় কেউই তারাপদর মৌলিকতা নিয়ে প্র তুলবেন না, তার বাচনের নিজস্বতা নিয়ে সংশয় রাখবেন না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com